দি সাইলেন্স

বার্গম্যানের ত্রয়ী ছবির তৃতীয় ছবি, 'দি সাইলেন্স'। অপর দুটি ছবি হল —'উইন্টার লাইট' এবং 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি'। ছবির শুরু একটি ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের প্রতিধ্বনির মধ্যে দিয়ে। তারপরই দেখি একটি ট্রেনের কামরার দৃশ্য। ট্রেন ছুটে চলছে। কোথা থেকে আসছে কিংবা কোথায় যাচ্ছে — আমরা কিছুই জানি না। কিছু অবোধ্য ভাষা এবং বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে তৈরী হয়েছে এক আশ্চর্য পারিপার্শ্বিকতা। ঐ একই দৃশ্যে পরিচালক ট্রেনের জানলা দিয়ে আমাদের ট্রেনের বাইরের এক ধ্যানমগ্ন অবিস্মরণীয় দৃশ্যের মধ্যে নিয়ে যান। যেথায় দেখি ছোট ছোট পাহাড়ের সারির পিছনে লাল অস্তগামী সূর্য। আর চলন্ত ট্রেনের লাইনের পাশে শুকিয়ে যাওয়া ডোবা। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য শৈল্পিক বিকাশ। ছবির উপাদানকে হিসেব করে অথচ পরিপূর্ণ ভাবে দেখানো। এমন আশ্চর্য-উদ্ভাবনী শিল্প-বিকাশ শুধু বার্গম্যানের পক্ষেই বুঝি সম্ভব। ট্রেনের কামরায় যাত্রী তিনজন। জোহান— দুর্বল অথচ আত্মসচেতন একটি বালক। জোহানের মা — উদ্ভিন্ন যৌবনা, ঘর্মাক্ত অ্যানা। অ্যানার বড় বোন ইষ্টার নামে আর এক রুগ্ন যুবতী, পেশায় সে অনুবাদিকা — মানসিকতায় বুদ্ধিজীবী। ব্যক্তিত্বে প্রখর কিনা জানি না তবে সে নিজের ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করেছে অন্যের, বিশেষ করে, অ্যানার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করার জন্যে বারবার।

এই ছবিতে আমরা বার্গম্যানের একটি পরিচিত ভংগীকে খুঁজে পাই — জীবন যেন হঠাৎ একটি পুরোনো জায়গায় এসে আবদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন দেখেছি 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি'তে — এক নির্জন সমুদ্রতীরে। 'টিমোকা' নামে অদ্ভুত এক শহরে ট্রেনটা এসে থেমে গেছে। টিমোকার প্রবেশ পথে ট্রেনটিকে যেন মনে হয় এক ভাসমান সেল্ মাত্র। মহাশূন্য থেকে নেমে এসেছে। ট্রেনের গতি আছে, কিন্তু ছন্দায়িত শব্দের অনুপস্থিতি আমাদের এমন এক অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

ইষ্টার, অ্যানা এবং জোহান আশ্রয় নিয়েছে শহরের পুরোনো এক পান্থশালায়। ট্রেন থেকে সোজাসুজি হোটেলের মধ্যে ক্যামেরা এনে ফেলেছেন বার্গম্যান। হোটেলের

করিডোর দিয়ে জোহানের উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো, দরজা, জানালা বিরাট বিরাট তৈলচিত্রগুলো যেন এক অনাবিষ্কৃত রহস্যময় জগতের ভগ্নাবশেষ।

শহরটির সামাজিক চেহারাও সাধারণের থেকে ভিন্ন। তার ভাষা এবং পারিপার্শ্বিকতা দুর্বোধ্য। দেশ ও কালের সীমারেখা একাকার হয়ে যায়। তাই কখনও সাইরেনের শব্দ, সৈনিকের দৃশ্য কিংবা ভারী ট্যাঙ্কের উপস্থিতি বিক্ষিপ্তভাবে খণ্ডিত মানসিকতার সৃষ্টি করে। যেন বাইরের পৃথিবীর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে এবং রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধরত সৈনিকের ভয়ে এক নরকের দ্বীপ এই স্থানে আবদ্ধ হয়ে আছে। তারা যেন কোন অজানা সত্য থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় পালিয়ে এসেছে। অল্প আলো ও কুয়াশার আস্তরণে চরিত্রগুলোও যেন অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে মনে হয়। শুধু এই তিনটি প্রাণী নয় সমস্ত পৃথিবীই যেন এক অব্যক্ত জীবন যন্ত্রণায় অস্থির।

এই অব্যক্ত জীবন যন্ত্রণার আবরণই উন্মোচিত হতে দেখি এই রহস্যময় হোটেলের পরিবেশে। ইষ্টার অসুস্থ। সে বিছানায় শয্যাশায়ী। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে অনবরত মদ ও সিগারেট খেয়ে চলেছে। বিরক্তি, ঘৃণা আর অবসাদ তার অস্তিত্বকে নবতর কোন মূল্যকে মেনে নিতে সাহায্য করছে না। অপর দিকে অ্যানা ঠিক তার বিপরীত। দেখে মনে হয় সে অতিমাত্রায় কাম-সচেতন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অলস। এবং আরও মনে হয় সে যৌন ব্যাপারে হতাশ — কারণ সহযাত্রীর সংগে তার সমকামী সম্পর্ক তার কাছে অপ্রীতিকর ও অর্থহীন। তাই দেখা যাচ্ছে একলা ঘুরতে ঘুরতে এক পানশালায় প্রবেশ করে এবং সেখানে স্বল্পালোকিত পরিবেশে এক দম্পতিকে উন্মত্তভাবে যৌনক্রিয়ায় রত দেখে সে ঐ কাফের বারম্যানের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

ছবির পরিণতিতে দেখি ইষ্টারের মৃত্যু তখন এক অনিবার্য সত্য হতে চলেছে। বাবার মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে সে নিজের মৃত্যুশয্যার চিন্তায় পৌঁছে যায়। সে সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বৃদ্ধ ভৃত্যের কাছে উপদেশ বর্ষণ করে চলেছে। সম্ভবত এই কথাগুলি ছবির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ। সে বলছে : আমরা আমাদের নিজেদের আচরণের মধ্যেই সব কিছু মন্দ বলে ধরে নিই। কিন্তু এটা সঠিক মূল্যায়ন নয়। আমি একটি সঠিক শক্তির কথা বলছি — যে শক্তি দিয়ে আমরা আমাদের চলাফেরার বিচার করি। নিঃসংগতার কথা বলে কোন লাভ নেই, এটা অর্থহীন। তাই যে মানুষ প্রতিটি কাজের মধ্যে অর্থ খুঁজে বেড়ায়, প্রতিটি কাজকে খুঁটিয়ে বিচার করে এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয় যে মানুষকে তার আচরণের দ্বারা নয়, ঘটনার প্রতি তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই বিশ্লেষণ করা উচিত। সেই মানুষটির নিষ্ফল ক্রন্দনই 'দি সাইলেন্স' অর্থাৎ নীরবতা। সব শেষে সে যে কটি নতুন বিদেশী শব্দ শিখেছিল সেই শব্দকটি বালক জোহানকে একটি কাগজে লিখে শিখিয়ে দিচ্ছে। এ যেন পুরোনোকে

বিস্মৃতির তলায় ডুবিয়ে দিয়ে নতুনকে রক্ষা করা। বাইরে সাইরেন বাজছে। ইষ্টার ভয়ে কুঁকড়িয়ে গেছে চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে, যেন সেই চাদর মৃতকে ঢেকে দেওয়ার চাদর। সাইরেনের শব্দ থেমে গেছে, শুধু বাজছে বৃদ্ধ ভৃত্যের হাতের ঘড়িটি টিক টিক করে যা শোনা গিয়েছিল ছবির শুরুতে।

অ্যানা জোহানকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। ট্রেনটি যখন টিমোকা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সে ট্রেনের জানলা খুলে বৃষ্টির জলে তার নিজের মুখখানি ধুয়ে ফেলছে, যেন স্মৃতির ক্লেদকে ধুয়ে ফেলছে তার মন থেকে। আর ইষ্টার তার মনের শৃঙ্খল দিয়ে তার আত্মাটাকেই যেন শৃঙ্খলিত করে ফেলেছে শেষ পর্যন্ত। ইষ্টার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে কিন্তু অ্যানা বেঁচে থাকছে। এখানেই ছবির শেষ।

'দি সাইলেন্স' ছবির প্রধান দ্বন্দ্ব নৈতিক বিচার ও দৈহিক আবেদন, সংযম ও অসংযম, দেহ ও মনের মধ্যে। কোন কোন সমালোচক মনে করেন অ্যানা ও ইষ্টার একই আত্মার দুই দিক। তারা যে পরস্পরের বোন এ কথা ছবিতে পরিষ্কার কোথাও বলা নেই। শুধু টুকরো টুকরো সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের এ সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। অ্যানা যখন যাচ্ছে তখন তার প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখা যাচ্ছে আর ইষ্টারের দৃষ্টি সেই প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হচ্ছে। এ যেন একের অপরের দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখা। ইষ্টার জীবনের সংগে আপোষ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অ্যানার সব কিছুকে সহজ করে নেওয়ার ক্ষমতাতে সে ঈর্ষান্বিত। অ্যানা ও জোহান যখন রাত্রে ঘুমোচ্ছে সে তাদের অনাবৃত শরীরের দিকে একই সংগে ঘৃণা ও লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেখানে হতাশা থেকে মুক্তির লোভে অ্যানা অবৈধ যৌনমিলনের মধ্যে শান্তি খুঁজছে, ইষ্টার সেখানে অবিরাম মদ্যপান ও ধুমপানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। রেডিওর গান তার ব্যথাকে অল্পক্ষণের জন্য উপশম করেছে বটে কিন্তু সংগে সংগে সে রেডিও বন্ধ করে দিচ্ছে — যেন এই গান তার নিঃসংগ জীবনের সংগে সামঞ্জস্যহীন। অ্যানা যখন দৈহিক ভোগের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে তখন ইষ্টারের চেহারা যেন এক ঈর্ষার প্রতিমূর্তি। সে শেষবারের মতো চেষ্টা করছে তাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখার। কিন্তু বারম্যানের সাথে অ্যানাকে একই শয্যায় প্রত্যক্ষ করে সে এত আঘাত পায় যে যন্ত্রণায় কুঁকড়িয়ে ওঠে — যেন এক স্বামী তার স্ত্রীকে পরপুরুষের সংগে অবৈধ মিলনে রত দেখছে। যদি অ্যানা ও ইষ্টার দুই প্রান্ত তবে এ দৃশ্যতে সেই দুই প্রান্তের মুখোমুখি সংঘর্ষ। অ্যানা ইষ্টারের প্রতি বিকারগ্রস্ত ঘৃণায় ফেটে পড়ে বলছে, 'তোমার যা কিছু সবই তোমার নিজের মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে , তুমি যেন তা ছাড়া বাঁচতেই পার না। ... বাবা যখন মারা যান তুমি তখন বলেছিলে, তুমি আর এক মুহূর্তও বাঁচতে চাও না, তবে তুমি কেন এখনও বেঁচে আছ?' ইষ্টার তার এই চরিত্র উদ্‌ঘাটনে সম্বিত

ফিরে পায় আর ভাবাবেগের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। সে সরে এসে জানলা দিয়ে দেখে কতকগুলি বামন সৌখিন পরিধানে সারিবদ্ধভাবে রাস্তা দিয়ে চলেছে। তাদের দেখে তার মনে হচ্ছে তারা মৃত্যুকে পেছনে পেছনে টেনে নিয়ে চলেছে। তারপর সে আবিষ্কার করে তার ও অ্যানার অনুভূতির গতিবেগ এই বামনগুলির শরীরের মতো এক জায়গায় এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছোট হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যায়।

টুকরো টুকরো দৃশ্যের সংস্থাপনায়, পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেল্‌সের সহায়তায় এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিচালক একটি নিরবচ্ছিন্ন সুরধারায় দর্শককে ডুবিয়ে দেন। তখন এক একটি ক্ষুদ্রতম ঘটনাও অর্থবহ হয়ে ওঠে, যেমন একদিকে অ্যানার বাথরুমে অবিরাম সাবান মাখা অপরদিকে ইষ্টারের দম বন্ধ হয়ে যাওয়া অবিরাম কাশি ও তার মুখ দিয়ে থুথু ও কফ্ ইত্যাদি বেরিয়ে আসা।

বৃদ্ধ ভ্যালেটের (পরিচারক) প্রথম আবির্ভাব অতি সাধারণ, কিন্তু ইষ্টারের আত্মরতির পর তার নিষ্ফল ক্ষোভ ও ক্রোধপ্রকাশের সময়ে তার এই প্রথম উপস্থিতি ও ইষ্টারের মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেওয়া — নিশ্চয়ই অসাধারণ এবং এরপর ইষ্টারের শয্যার নোংরা চাদর বাইরে নিয়ে যাচ্ছে যখন বৃদ্ধ ভ্যালেট, তখন আরও অব্যক্ত কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। আমরাও যেন ইষ্টারের মতো অনুভব করি এই নম্র বৃদ্ধ যেন তাকে ক্ষমা করেছে। এই বৃদ্ধ যেন তার পিতার মতো, যেন ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কিছু। এই অনুভূতি অন্য এক দৃশ্যেও প্রকাশ পায়। সে দৃশ্যটি হচ্ছে বালক জোহানের সাথে ঐ বৃদ্ধের সাক্ষাৎ। বৃদ্ধ জোহানের সাথে নম্র ব্যবহার করছে। তার হাতে কিছু টফি ও কিছু ছবির পোষ্টকার্ড দিচ্ছে। বালক ছবিটিকে দেখে কার্পেটের নীচে লুকিয়ে রাখছে। এই ছবিটি বৃদ্ধের মায়ের সৎকারের ছবি। ছবির মাধ্যমে বৃদ্ধ বালকটির সাথে যেন মৃত্যুর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত বিশদ ও প্রাণবন্ত। প্রকৃতিগত ও রূপগত দু-দিক থেকেই।

ঈশ্বরের সবচেয়ে নৈকট্য আমরা অনুভব করি বৃদ্ধ পরিচালক ভ্যালেটের মধ্যে বুঝিবা। সে সর্বত্রই বিদ্যমান — কখনও অ্যানার ভালবাসার দৃশ্যে কখনও ইষ্টারের শয্যাপার্শ্বে। সে নবীনকে সাদরে গ্রহণ করছে আর একদিকে বাস্তব জীবনের দীক্ষা দিচ্ছে তরুণ জোহানকে। তিনি সকল দুঃখ বেদনার অতীত। তার উপস্থিতিই ইষ্টারকে উদ্বুদ্ধ করেছে আত্মসমীক্ষায়। ইনিই যেন ইষ্টারের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। অথবা ঈশ্বরের নীরবতাই কি 'দি সাইলেন্স'। এবং এই নীরবতারই আড়ালে মানুষের অবৈধ কার্যাবলী এবং সেই সংগে তার অবমাননাকে ইমেজের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ করে তোলা। সার্থক ইমেজের সৃষ্টি হয়েছে যখন স্কোয়ারের মধ্যে ট্যাঙ্কের চলাফেরা এবং সেই আরোহীবিহীন ট্যাঙ্ক হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ানোকে ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বরের

নীরবতাকে অর্থাৎ তাঁর অবস্থানকে অস্বীকার করবার জন্য দেখানো হয়েছে। মনে হয় ঈশ্বর যেন এক ধ্বংসের যন্ত্রবিশেষ। এই দৃশ্য 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি' ছবিতে সেই হেলিকপটারকে মনে করিয়ে দেয়। আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অমানবীয় ধ্বংসাত্মক এবং ব্যাখ্যার অতীত। তবে এর উপস্থিতি অনুভব করা যায় ইষ্টারের পাশে টেবিলের উপর রাখা গ্লাসের কম্পন থেকে। অ্যানের যৌনক্রীড়ার পর তার জানালার পাশে দাঁড়ানোর সময় এবং ভৃত্যের ইষ্টারের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে দম দেওয়ার সময় অসীম নীরবতার মাঝে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ — তার অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়।

বার্গম্যান 'দি সাইলেন্স' ছবিতে জীবনের গভীরতাকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখিয়েছেন। বার্গম্যানের মনে এ ছবির ধারণা কিভাবে এসেছিল সে সম্বন্ধে তিনি স্মৃতি কথায় আভাস দিয়েছেন। 'চার বছর আগে আমি যখন এক হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম চারজন স্বাস্থ্যবতী হাস্যময়ী যুবতী নার্স এসে মাঠের মধ্যে এক রুগ্ন কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধকে ট্রলিতে করে বয়ে নিয়ে গেলো। সেইদিন থেকে এই দৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিরূপ হয়ে আমার মনে থেকে গিয়েছিল, এই রকম ছোট ছোট ঘটনা বা কোন ছবির কোন দৃশ্য অথবা কোন অভিনেতার বিশেষ ভংগী কোন বিশেষ ভাবের প্রতীক হিসেবে আমার মনে থেকে যায়; আর সেই সমস্ত প্রতীক ভাবকে আমার ছবিতে পরে আমি আবার কাজে লাগাই।' তাই এই ছবিতে বার্গম্যান সব চরিত্রের প্রতিই সমান সহানুভূতিপ্রবণ, কেননা মানবিক ত্রুটির সীমার মধ্যেই এরা অচলায়তন ভাঙ্গতে চায়। অথচ পারে না। সেই পরম সত্যের দর্পণে এই মানব মানবীদের নিষ্ফল আস্ফালন কত সহজেই ধরা পড়ে স্বার্থপরতা, জাগতিক জীবনের প্রতি তীব্র মমতাবোধ মানুষকে করেছে অসহায়। তার জীবনকে করেছে খণ্ডিত। তবুও বার্গম্যান অন্য ছবিতে যেমন এ ছবিতেও তেমনি জীবন সম্বন্ধে এক আশার বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন। সেই আশা বালক জোহানের মধ্যে ঘনীভূত; কারণ সে যখন ইষ্টারের শেখানো অজানা অবোধ্য শব্দগুলো উচ্চারণ করছিল তখন মনে হচ্ছিল সে যেন ভবিষ্যৎ অজানা সভ্যতার দূত; যেন জীবনকে সে শুরু থেকে আবার যাপন করতে শিখেছে। সবচেয়ে অভিভূত করে যা সেটা হচ্ছে সেই দৃশ্য যে দৃশ্যে অ্যানা তার প্রেমিকাকে বিছানায় ছেড়ে জানলায় ঝাঁঝরির ভিতর দিয়ে বাইরের স্কোয়ারের ভিতর দেখছে কতকগুলি লোক একটা পিপে ঠেলে গড়িয়ে দিচ্ছে, আর তার ভিতর থেকে নোংরা জল বেরিয়ে আসছে — এ যেন দান্তের সেই নরকের চক্রের মতো।